JUL 15 2002

দৈনিক সংবাদ

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ভিন্ন মত ভিন্ন কথা

ফয়েজ মাহমুদ

আমরা চাই, অসুস্থকে সুস্থ করার যথোপযুক্ত সুচিকিৎসা। বর্তমান অসুস্থ এবং সন্ত্রাসকবলিত ছাত্র রাজনীতিকে সুস্থ করে তুলে সুষ্ঠু ধারায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিতে হবে এদেশেরই রাজনীতিবিদদের। বিশেষ করে যেসব নেতা সরাসরি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন তারা নিশ্চুপ থাকেন কোন্ স্বার্থে? তোফায়েল, রাজ্জাক, আমু, মান্নান ভুঁইয়া, শাজাহান সিরাজ, মতিয়া, মেনন, সেলিম, দিলীপ বড়ুয়া কিংবা কাজী জাফর বা ফেরদৌস কোরেশী, আল মুজাহিদী, নির্মল সেন প্রমুখ মান্যব্যক্তি কি তাদের অতীতকে অতীতেই মিলিয়ে দেবেন? বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনারও ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য রয়েছে। দেশের সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের দাবি, আপনারা যে যার ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির সুষ্ঠু ধারা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হোন। আপনাদের নিয়ন্ত্রণের ছাত্র সংগঠনগুলো থেকে অছাত্রদের বের করে দিন। সন্ত্রাসীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন।

একটি শিশু পাঠ্যপুস্তকে এক সময় পাগলা কুকুরের এক ধন্বন্তরি চিকিৎসার কথা পড়েছিলাম। 'পাগলা কুকুরের চিকিৎসা' শিরোনামে চিকিৎসার পদ্ধতি লেখা ছিল এরকম ঃ 'কুকুর পাগল হইলে তাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে।' বিগত শতকের পাঁচের দশকে এমন 'চিকিৎসা' হাস্যকর না ঠেকলেও একবিংশ শতকের 'চ্যালেঞ্জ' মাথায় নিয়ে এমন চিকিৎসা কেউ মেনে নিতে পারেন না। অথচ এ একবিংশ শতকে এমন 'দাওয়াইপত্র' পেয়ে আনন্দে বগল বাজাতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। যেন এমন মোক্ষম দাওয়াই আর কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

শিক্ষা সংস্কার জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ এবং প্রধানমন্ত্রীর বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাবকে ওই 'পাগলা কুকুর চিকিৎসার' সঙ্গে তুলনা করা যায়। এমন একটি 'সাধু প্রস্তাবে' অনেক জ্ঞানগম্যধারী ব্যক্তি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বানকে সমর্থন করে অনেকেই বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছেন। এরা আবার বর্তমান বিরোধী নেত্রীর শাসনামলে তাদের ছাত্র সংগঠনের কথিত কুকর্মগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন বারবার। এসব পরামর্শে যতটা না বর্তমান সন্ত্রাসের উল্লেখ থাকে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি থাকে গত সরকারের আমলের সন্ত্রাসের কথা। প্রচ্ছন্নভাবে তারা যেন বলতে চান, আগের সন্ত্রাসের চেয়ে বর্তমান সন্ত্রাস অনেক কমজোরি কিংবা পূর্ববর্তী সন্ত্রাসের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায়ই বর্তমান সন্ত্রাস। অর্থাৎ সন্ত্রাস দমন বা বন্ধের চেয়ে সরকারভেদে সন্ত্রাসের তুল্য মূল্য বিচারই যেন মুখ্য। 'চতুর্থ রাষ্ট্র' দেশের সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন দৈনিক ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সমর্থনে সম্পাদকীয় লিখে 'সরকারের সমর্থনকারী প্রচার মাধ্যম' হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার ব্রতে ব্রতী হচ্ছে। বলাবাহুল্য, 'নিরপেক্ষতা' এসব দৈনিকের কপালে রাজটিকার মতো জ্বলজ্বল করছে। এসবই সম্ভব এই 'সব সম্ভবের' দেশে। এদেশের হাজারো বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিদেশী শাসকের কথিত বাণী 'কি বিচিত্র এই বাংলাদেশ' একেবারেই কি ভুলে যাবে বাঙালি?

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব-প্রসঙ্গ এর আগে একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে এদেশে। এমনকি রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতির কাছ থেকেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব এসেছে। তখন এর তেমন জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়নি। বর্তমান সমর্থনের মূল কারণ বোধকরি সমর্থনকারীদের বিবেচনায় এ প্রস্তাব অধিকতর 'গণতন্ত্রী'। মহান জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের নেত্রীর প্রস্তাব। এ প্রস্তাব সমর্থন না করলে অগণতন্ত্রী বা গণতন্ত্রবিরোধী ভাবতে পারে কেউ— এমন আশঙ্কাও থাকতে পারে!

দেশে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বর্তমান প্রস্তাবের কারণ হিসেবে বলা হয়, ছাত্র রাজনীতির স্থূতার কথা। বর্তমানে দেশের ছাত্র রাজনীতি অসুস্থ। হানাহানি, অস্ত্রবাজি, ছিনতাই, াজি, হাইজ্যাক, টেন্ডারবাজির মতো অপকর্ম াজনীতিকে পেয়ে বসেছে। সম্প্রতি বুয়েটের ছাত্রী সনি নিহত হওয়ার ঘটনাকেই ছাত্র ইর অসুস্থতার অন্তিম অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত য় থাকে। অথচ দেশবাসী নিশ্চয়ই জানেন, কাণ্ডের মূল কারণ টেন্ডার-সন্ত্রাস। কোন রাজনৈতিক আদর্শ কিংবা রাজনৈতিক সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই। একই নামে দু'টি সশস্ত্র গ্রুপের টেন্ডার ুদ্ধের সঙ্গে রাজনীতি না ছাত্র রাজনীতির তটুকু— এ প্রশ্ন থেকেই যায়। আর এ নপটিয়সীদের মধ্যে কত অংশ নিয়মিত কবল বুয়েট নয়, সারাদেশে খোঁজ নিয়ে াবে অছাত্র সন্ত্রাসীরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক। যে কখনও বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ারোয়নি এমন সন্ত্রাসীরাই নিয়ন্ত্রণ করছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। ছাত্র নয় অছাত্ররাই আজ নিয়ন্ত্রণ করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথা ছাত্র রাজনীতিকে। ছোট-বড় যে সন্ত্রাসীরা এক সময় ছাত্র রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের শক্তি হিসেবে ছাত্র রাজনীতির হাত ধরে প্রবেশ করেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ছিল ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে তারা এখন নিয়ন্ত্রণ করছে গোটা ছাত্র রাজনীতি। ছাত্র রাজনীতি তাদের মুখ্য বিষয় নয়, সন্ত্রাস আর তার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন তাদের ব্রত। এদের কাউকে ছাত্র বা ছাত্র রাজনীতিক বলা যায় না। 'ছাত্র' এই বিশাল বিষয়টির ওপর এরা পরগাছা বিশেষ; কিন্তু এরকমটি তো অতীতে ছিল না।,১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ বিগত শতকের চার ও পাঁচের দশকে এদেশে ছাত্র রাজনীতি শুরু এবং ব্যাপ্তি। ছয়ের দশককে এদেশের ছাত্র আন্দোলন তথা ছাত্র রাজনীতির স্বর্ণযুগ বলে বিবেচনা করা হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে যে যাত্রা শুরু, বাষট্টির শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব ান এসব ঐতিহাসিক ঘটনা কি অস্বীকার করা রে? সেই আন্দোলনের পথ ধরেই তো গত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আর আজকের স্বাধীন লাদেশ।

ছাত্র রাজনীতির এমন গৌরবকেও সেদিন লঙ্কিত করতে উদ্যত হয়েছিল স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী মহল। আইয়ুবীয় রাজনীতির ঔরসজাত রাজনীতিক সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন সংক্ষেপে এনএসএফ সৃষ্টি করে ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসী ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হল ছিল এ ছাত্র সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল। এনএসএফ নেতাদের সেই বিভীষিকাময় 'ছাত্র রাজনীতি' সেদিন আতঙ্কিত করে তুলেছিল দেশের প্রাণ শিক্ষায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। হলে অস্ত্র আমদানি এদেরই হাতে, এমনকি তারা নাকি সাপও পুষত তাদের হলে। এরকম আরও নানা অদ্ভুত কথা প্রচলিত ছিল তাদের সম্পর্কে। ছাত্র নামের কলঙ্ক এ পেটোয়া বাহিনীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অর্থনীতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদকে শারীরিক নাজেহাল করার মধ্য দিয়ে। এই নৃশংস আক্রমণ কোন রাজনৈতিক আদর্শগত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল পেটোয়া বাহিনী-কর্তার আত্মীয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। সেদিন যে 'বীর সূর্য সৈনিকেরা' এ অঘটন ঘটিয়েছিল পরেরদিন তাদের স্বদর্প ছবি ছাপা হয়েছিল দৈনিক পত্রিকায় ঃ হকিস্টিক হাতে বীরদর্পে বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে ফিরে যাচ্ছে গন্তব্যে। তারা তখন ছিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাগালের বাইরে।

এ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আক্রমণের আরেকটি লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনের 'ইকবাল হল'। আজকের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। এ হলটি ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-সমর্থকদের আবাস। ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ এ হলের সাধারণ ছাত্ররাও সব সময় তটস্থ থাকত এনএসএফ-এর আক্রমণ আশঙ্কায়। সেই আক্রমণ আশঙ্কায় সেদিন হলের ছাদে 'সার্চলাইট' লাগিয়ে চৌকি বসানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য— সম্ভাব্য আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করে সজাগ হওয়া এবং প্রতিরোধ করা কিন্তু সে প্রতিরোধ কতটা সার্থক হয়েছে তা কেবল ইতিহাসই বলতে পারে। তবে একথা ঠিক, সেদিনের এ সন্ত্রাসী হামলায় ইকবাল হলের অনেক মাসিক ভোজ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, অনেক ছাত্রনেতাকে জীবন বাঁচাতে হয়েছে দৌড়ে পালিয়ে বা বাথরুমে আশ্রয় নিয়ে। একদিন এমন হঠাৎ আক্রমণে দিগ্বিদিক্ হারা ছাত্রনেতাদের জীবন বাঁচাতে হয়েছিল বিবস্ত্র হয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে। সেদিনের সেই শিহরণ জাগানো ঘটনা যেকোন হিন্দি ছবির থ্রিলকেও হার মানায়।

সেদিনের ছাত্র রাজনীতির আড়ালের এ নৃশংসতা, অস্থিরতা, সন্ত্রাস তথা আদর্শচ্যুতি সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি বরং সেদিনের সুস্থ ছাত্র রাজনীতির ধারা থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতৃবৃন্দ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা কি বাঙালি একেবারেই ভুলে যাবে, না যেতে পারবে? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কত দেশপ্রেমিক বীর ছাত্র- মুক্তিযোদ্ধা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে আর কত যে প্রাণ দিয়েছে, তার নিকাশ কে রাখে?

দেশ স্বাধীনের পর দেশে ছাত্র রাজনীতির নতুন কোন দিক-নির্দেশনা না থাকায় ছাত্র রাজনীতি কিছুটা থমকে যায়। গুছিয়ে উঠতে না উঠতেই নতুন হঠকারী ধারার রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র-রাজনীতিতেও তার প্রভাব পড়ে। সূত্রপাত হয় দখলদারি পালটা দখলদারির পালা। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গীয় নকশালবাড়ি ধারায় শ্রেণীশত্রু হননের রাজনীতিতে অনেক মেধাবী ছাত্রের হাতে উঠে আসে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। অন্যদিকে পূর্ববর্তী কোন কোন সংগঠন যখন দেশ গড়া তথা অর্থনৈতিক মুক্তির কেতাবী মন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছে তখন স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানের দাবিদার ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অধিকার সূত্রে সবকিছুর মালিকানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দখলের হাত বাড়ায় সর্বত্র। ফলে ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হয় নতুন ধারা। দখল-বেদখল, কন্ট্রাক্টরি, হাইজ্যাক, প্রতিপক্ষ নিধন হয়ে ওঠে নিত্যদিনের কাজ। সদ্য যুদ্ধ ফেরত অনেকের হাতে থেকে যাওয়া অস্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে এসব অপকর্মে। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চার ছাত্রনেতা হত্যার কথা কেউ ভুলে যাবেন না নিশ্চয়ই। সেই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামিও পরবর্তী সময় মুক্তি পেয়েছিলেন কোন সামরিক শাসকের করুণায়।

এ অস্থির-অস্বস্তিকর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ঘটে যায় পঁচাত্তরের করুণতম ট্র্যাজেডি। রাষ্ট্র শাসনে চেপে বসে সামরিক জান্তা। সামরিক খোলস ছেড়ে 'গণতন্ত্রে উত্তরণে' 'আস্থা' ভোট, নানা দল সৃষ্টি আর বিসর্জন ইত্যাদি খেলায় ছাত্রদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ইতিহাস কারও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। রাজনীতিকে 'ডিফিকাল্ট' করে তোলার মহৎ অভিপ্রায়ে যা যা করার, সবই করা হয়েছিল সেদিন। যার মধ্যে একাত্তরের পরাজিতদের পুনর্বাসন, ক্ষমতার অংশ বিতরণ, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের বাধ্যতামূলক সংযুক্তায়ন, স্বদলের ছাত্র সংগঠনকে পেটোয়া বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে অস্ত্র আর অর্থের উদার বিতরণ, সামরিক-আধাসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে ছাত্র রাজনীতি পর্যবেক্ষণ-নিয়ন্ত্রণ প্রয়াসে ব্যবহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাত বছরের মাথায় ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে দ্বিতীয় সামরিক শাসনামলের শুরুতে আবারও 'আস্থা' ভোট, নতুন রাজনৈতিক দলের জন্মপ্রদানসহ ক্ষমতা স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়ায় নানা ফন্দি-ফিকিরের মধ্যে ছাত্র রাজনীতিকে ব্যবহারও বাদ যায়নি, বরং যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। ছাত্রনেতাকে মহান জাতীয় সংসদে এমনকি মন্ত্রীর নরম গদিতে বসার সুযোগ দিতেও পিছপা হয়নি এ শাসকগোষ্ঠী।

উভয় সামরিক আমলেই ছাত্র নামধারীদের অতিরিক্ত কিছু প্রদান, অবাঞ্ছিত পুরস্কারায়ন, ছাত্র জীবনেই অর্থ এবং বিপুল অর্থ উপার্জনের মানসিকতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ উপায় উদ্ভাবনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র রাজনীতিতে এমন হতাশা আর নৈরাজ্যের মধ্যেও নব্বইয়ের গণজাগরণ এবং সামরিক জান্তা হটানোর আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আবার প্রমাণ করল জাতীয় ক্রান্তিতে ছাত্র সমাজের অমোঘ ভূমিকার কথা।

একানব্বইয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলেও সেই সরকার ছাত্রসমাজকে সুষ্ঠু ধারায় ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করে বরং পূর্ব ধারাকে আরও পুষ্টি সাধনে ব্রতী হয়েছে। সংসদ সদস্য বানানোসহ দেশব্যাপী পেটোয়া বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্র নামধারীদের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতির ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীদের ব্যবহার ছাত্র রাজনীতিকে কলঙ্কের পঙ্কিলে ঠেলে দেয়। সেই সঙ্গে কথিত ছাত্রনেতাদের মধ্যে ঠিকাদারি বণ্টনসহ নানা পথে অর্থ উপার্জনের দিকে তাদের মনোযোগী করে তোলে।

১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে একুশ বছরের বঞ্চনা ত্বরিতই পুষিয়ে নেয়ার কাজে উদ্যোগী হয়। অগোছালো ছাত্র সংগঠনের নানা পর্যায়ে পেশাদার ছাত্র রাজনীতিকরা প্রবেশ এবং প্রভাব বিস্তার করে আগের অবস্থাকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে। প্রায় অর্ধশত বছরের পুরনো এ ছাত্র সংগঠনটি তার দীর্ঘ ঐতিহ্যের কোন ছাপই রাখতে পারেনি। বরং অছাত্রসুলভ সকল কর্মকাণ্ডে তাদের 'ন্যায্য' অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ফলে দখল, চাঁদাবাজি, কন্ট্রাক্টরি ইত্যাদি কোন কাজ থেকেই এরা দূরে থাকেনি। প্রথমদিকে এ কথিত ছাত্র রাজনীতির ওপর সরকার ও মূল দলের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকলেও শেষের দু'এক বছর তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

২০০১-এর অক্টোবরের নির্বাচন বা তারও আগে থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সঙ্গে দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হতে থাকে এবং এ পরিবর্তনে ছাত্র নামধারী যুবকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনে জয়কে এরা যুদ্ধ জয়ের অর্জন বিবেচনা করে রাতারাতি সব দখল আর হস্তগত করার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। আওয়ামী সমর্থক আর সংখ্যালঘুদের বিষয়-সম্পত্তি এমনকি নারীকে এরা 'গণিমতে'র মাল বিবেচনা করে। এমনকি প্রতিপক্ষের কাউকে পৃথিবীর আলো-বাতাসেই দেখতে চায় না এরা। ক্ষমতাসীন দল এবং সরকারিভাবে এদের দেয়া হতে থাকে লাগামহীন আস্কারা। গত সাধারণ এবং পরের তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সরাসরি ছাত্রনেতা এবং তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের মনোনয়নদান তার উপযুক্ত প্রমাণ। রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক সন্ত্রাসী প্রতিপালনের এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত এবং আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, এ সন্ত্রাসীদের অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করা হয় ছাত্র তথা ছাত্র রাজনীতির নামে। বরং বলা যায়, ছাত্র রাজনীতি এখন নামমাত্র ছাত্র রাজনীতি, বাস্তবে এ এক ব্যাপক যুব সন্ত্রাসনীতি আর এ যুব সন্ত্রাসনীতিই নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্র রাজনীতির ধারাকে।

প্রসঙ্গত দেশের বড় রাজনৈতিক দল তথা তাদের অন্য অঙ্গসংগঠনসহ ছাত্র সংগঠনে গণতান্ত্রিক চর্চা একেবারেই অনুপস্থিত। দল প্রধান বা আঞ্চলিকভাবে দল নিয়ন্ত্রকের ইচ্ছা-নির্দেশের বাইরে কোন সংগঠনের কোন শাখা সম্মেলন করে সাধারণ কাউন্সিলর দ্বারা নির্বাচিত কোন কমিটি গঠিত হয়েছে— এমন দৃষ্টান্ত বোধকরি গত ত্রিশ বছরে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। বলা ভাল, ছোট দলগুলোর ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত নেই। যাহোক, ছাত্র সংগঠনগুলোয় যথাযথ গণতন্ত্রচর্চা না থাকার কারণে ছাত্র-অছাত্র নির্বিশেষে ছাত্র সংগঠন করার সুযোগ পাচ্ছে বা ছাত্র সংগঠনগুলোকেই দখল করে নিচ্ছে এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করছে নিজ নিজ স্বার্থে। প্রশ্ন 'দেশ' বা 'জন'নেতারা এ ব্যাপারে উদাসীন কেন?

বর্তমান বাংলাদেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রক-নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশ নেতাই (দু'একজন বাদে) উঠে এসেছেন ছাত্র রাজনীতি থেকে। ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতাই তাদের বসিয়েছে দল আর সরকারের উচ্চ থেকে সুউচ্চ আসনে। তা সত্ত্বেও কিভাবে তারা 'ছাত্র রাজনীতি' কথাটিকেই কলঙ্কিত হওয়ার পথ সুগম করলেন নিজেদের স্বার্থে ছাত্র সন্ত্রাসী একীভূত করে?

সব মিলিয়ে একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, বর্তমান বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি কারোর কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। সে পরিপ্রেক্ষিতেই আজ প্রস্তাব আসছে 'ছাত্র রাজনীতি' বন্ধের। সেই সঙ্গে প্রশ্ন— ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হয়ে গেলেই কি দেশের সন্ত্রাসীরা সব 'দুষ্টদের মতো' পালিয়ে যাবে? নাকি কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে বা বঙ্গোপসাগরে আত্মবিসর্জন দেবে? না, তারা থাকবে এবং থাকবে। ছাত্র রাজনীতির আশ্রয় ছেড়ে আশ্রয় খুঁজবে অন্যত্র। এ আশ্রয়স্থল নিশ্চয়ই রাজনীতি। যার প্রমাণ ইতোমধ্যেই আমরা পেয়েছি গত সাধারণ এবং সিটি করপোরেশন নির্বাচনে। তাহলে কি আমাদের সেই প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যে, দেশের রাজনীতিকে সন্ত্রাস পেয়ে বসেছে, অতএব 'দেশের রাজনীতি বন্ধ করে দাও'! তাতেও হয়ত কারও জন্য কল্যাণ হয়ে আসতে পারে; কিন্তু আমাদের তা কাম্য নয়।

আমরা চাই, অসুস্থকে সুস্থ করার যথোপযুক্ত সুচিকিৎসা। বর্তমান অসুস্থ এবং সন্ত্রাসকবলিত ছাত্র রাজনীতিকে সুস্থ করে তুলে সুষ্ঠু ধারায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিতে হবে এদেশেরই রাজনীতিবিদদের। বিশেষ করে যেসব নেতা সরাসরি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন তারা নিশ্চুপ থাকেন কোন্ স্বার্থে? তোফায়েল, রাজ্জাক, আমু, মান্নান ভুঁইয়া, শাজাহান সিরাজ, মতিয়া, মেনন, সেলিম, দিলীপ বড়ুয়া কিংবা কাজী জাফর বা ফেরদৌস কোরেশী, আল মুজাহিদী, নির্মল সেন প্রমুখ মান্যব্যক্তি কি তাদের অতীতকে অতীতেই মিলিয়ে দেবেন? বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনারও ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য রয়েছে। দেশের সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের দাবি, আপনারা যে যার ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির সুষ্ঠু ধারা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হোন। আপনাদের নিয়ন্ত্রণের ছাত্র সংগঠনগুলো থেকে অছাত্রদের বের করে দিন। সন্ত্রাসীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন।

ছাত্র রাজনীতি ক্ষমতা দখল কিংবা দখল-বেদখল বা অর্থ উপার্জনের পথ নয়। ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পাথেয়। ছাত্র রাজনীতি চোখ-কান খোলা জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষের সচেতন শিক্ষিত নাগরিক গড়ার কারখানা। এ পথে সার্থকতা অর্জনে ব্যর্থ হলে আমাদের সবাইকে দায়ী হতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, আমরা চাই সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতির সুস্থ-সবল বিকাশ।